লিসবন শহরের একাংশ

ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ

পর্তুগালের এভোরাতে

সভ্যতার ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে ইউরোপ সম্পর্কে একটু বাড়তি কৌতূহল ছিল। প্রাচীন ধ্রুপদী সভ্যতার যুগে বেশিরভাগ নগরসভ্যতা গড়ে উঠেছিল এশিয়া ও আফ্রিকায়। শুধু গ্রিস এবং রোমেই প্রাচীন নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটে। গ্রিসে নগরসভ্যতা গড়ার আগে সভ্যতার প্রস্তুতি পর্ব চলছিল ইজিয়ান সাগরের বুকে জেগে ওঠা বড়সর দ্বীপ ক্রিটে। মিনীয় সভ্যতা বিকাশের মধ্য দিয়ে ইউরোপে সভ্যতার যাত্রা শুরু। এর পরপরই দক্ষিণ গ্রিসে মাইসেনিতে গড়ে উঠে সভ্যতা। মিনীয় ও মাইসেনীয় সংস্কৃতির ঢেউ লাগে গ্রিসের মূলভূমিতে। একে একে নগর সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে। প্রায় একই সময়ে টাইবার নদীর তীরে রোম নগরীতে নগর সভ্যতা গড়ে উঠতে থাকে। ইউরোপের এই দুই সভ্যতা ছাড়া পৃথিবীর বাকি নগরসভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তাই কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে সকল অঞ্চলে। কিন্তু ভিন্ন চরিত্র ছিল গ্রিস ও রোমে। টাইবার নদীর ছোট্টধারাটিকে বাদ দিলে গ্রিস ও রোমে বড় কোনো উল্লেখ করার মত নদী নেই। আছে সাগরসান্নিধ্য। তাই এসব অঞ্চলে সভ্যতা গড়ে ওঠার চরিত্র ছিল আলাদা। এখানে সভ্যতার কারিগররা সমুদ্রকে ব্যবহার করেছে। সাগরনির্ভর অর্থনীতি এদের বুনিয়াদ তৈরি করেছে। এ কারণেই গ্রিসে গড়ে উঠেছিল উপনিবেশবাদী চরিত্র আর রোমে সাম্রাজ্যবাদী। বিশ্বের নানা অঞ্চলে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটিয়েছে।

ভ্রমণ

আধুনিক ইউরোপের মূল কাঠামোটি গড়ে উঠেছে মধ্যযুগে। ৪৭৬ খ্রিষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটে প্রাচীন বিশ্বের নগরসভ্যতা বা ধ্রুপদী সংস্কৃতির। এরপর নতুন করে সভ্যতা দানা বাঁধে ইউরোপে। মধ্যযুগের বিশ্বসভ্যতার যাত্রা শুরু হয় এভাবেই। এই সভ্যতা গড়ে ওঠে গ্রাম-সংস্কৃতির ওপর। নাগরিক জীবনের বাইরে থেকে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর ইউরোপে মধ্যযুগের সভ্যতা যাত্রা শুরু করে। সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণে ছোট ছোট ভৌগোলিক অবস্থানে এক একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। একসময় ইউরোপ সামন্ত অর্থনীতি থেকে বেরিয়ে আসতে থাকে। ভৌগোলিক আবিষ্কারসমূহ নতুন শক্তি জোগায়। বাণিজ্য বিকাশ ঘটে। নতুনভাবে শহর গড়ে উঠতে থাকে। এক পর্যায়ে সময়ের ও বাণিজ্য-অর্থনীতির চাহিদায় শিল্পবিপ্লব ঘটে যায়। আধুনিক বিশ্বের যাত্রা শুরু হয়। এর অনুঘটক ইতালির রেনেসাঁস ও ফরাসি বিপ্লবের সুতিকাগার ছিল ইউরোপই।

এব কারণে একটি আলাদা আকর্ষণ ছিল ইউরোপের প্রতি। তাই ইউরোপ ভ্রমণের প্রথম সুযোগটি আমি হাতছাড়া করতে চাইলাম না। সময়টি ছিল ২০১৬ সালের এপ্রিল মাস।

এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ

শুরুটা করতে হয় বনিকে দিয়েই। কাগজপত্রে ও সাজিদ বিন দোজা। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক। অসাধারণ প্রতিভা এই তরুণ শিক্ষক ও স্থপতির। স্থাপত্যকলার এই মেধাবি ছাত্রটি আমার চোখে একজন অসাধারণ চিত্রশিল্পী। বাংলার প্রচীন, মধ্য ও ঔপনিবেশিক যুগপর্বের স্থাপত্যের দৃষ্টিনন্দন স্কেচ নিয়ে ওর একক চিত্র প্রদর্শনীও হয়েছে। অনেক বছর আগে অমন একটি প্রদর্শনী হয়েছিল ঢাকায় আলিয়াঁস ফ্রাঁসেসে। আমি আর প্রখ্যাত শিল্পী এবং কার্টুনিস্ট অধ্যাপক রফিকুন নবী (রনবি) এর দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলাম। এই বনি পিএইচডি গবেষণা করছিল পর্তুগালের এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। থিসিস জমা দিয়েছে। এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথামত জুরি বোর্ডে একজন বিদেশি অধ্যাপক থাকবেন। কয়েকটি দেশের অধ্যাপকদের জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে ওরা সভা করেছে। একদিন বনি জানালো এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ আমাকে আমন্ত্রণ জানাবে।

২০১৫-এর ডিসেম্বরের দিকে এভোরা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার সম্মতি পাওয়ার জন্য ই-মেইল করলো। জানালো আমার সুবিধাজনক

সময়ে ওরা তারিখ চূড়ান্ত করবে। আমার দেয়া তারিখ মত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৬ সালের ২৭ এপ্রিল, জুরিবোর্ড বসার তারিখ স্থির করলো। একই সাথে ওদের অনুরোধ ছিল ২৮ এপ্রিল যাতে আমি এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং ইউরোপীয়দের আগমন বিষয়ে বক্তৃতা করি। ওদের একাডেমিক কাজ খুব গোছানো। দিন কয়েকের মধ্যেই বনির থিসিসের সফট কপি ইন্টারনেটের মাধ্যমে পেয়ে গেলাম। এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণপত্রসহ সব ধরনের কাগজপত্র যথাসময়ে চলে আসায় ভিসা পেতে কোনো অসুবিধা হয়নি। এমিরেটস এয়ার লাইন্সের বিমান টিকিটও এসে গেল। ২৫ এপ্রিল সকাল ১০ টা ১৫ মিনিটে হযরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে ঢাকা-দুবাই ফ্লাইট যাত্রা শুরু করে। স্থানীয় সময় দুপুর সোয়া একটায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল সোয়া ৩টা) দুবাইতে অবতরণ করে বিমান। এমিরেটসের আরেকটি বিমান প্রস্তুত ছিল। স্থানীয় সময় দুপুর ২:৪০টায় আমাদের নিয়ে পর্তুগালের উদ্দেশ্যে উড্ডয়ন করে এমিরেটসের সুপরিসর বিমানটি। এই বিমানে ক্লান্ত হওয়ার অবকাশ নেই। আতিথেয়তার ছড়াছড়ি। বাড়াবাড়িও বলা যায়। আছে প্রত্যেক সিটের সাথে মনিটর। নিজের পছন্দ মত ছবি, গান বা খেলা দেখা। আর আছে নেভিগেশনের সুবিধা। চমৎকারভাবে বিমান যাত্রার রুট ও যাত্রাপথ দেখার ব্যবস্থা ছিল। আমি এখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করলাম। এই সুযোগে ভূগোলটাও ঝালাই করে নেয়া গেল।

লিসবনে অবতরণ

বিমান থেকে ভূগোল অর্থাৎ মানচিত্র মিলিয়ে শনাক্ত করতে পারছিলাম আমরা মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করছি। কুয়েত, বাহরাইন, বসরা, বাগদাদ, জেদ্দা, মদিনা হয়ে আমরা অতিক্রম করলাম সুয়েজ খাল, নীল নদ, মিসরসহ উত্তর আফ্রিকা। এরপর আমাদের বিমান এলো ইউরোপের আকাশে। একসময় পাড়ি দিলাম আইওনীয় সাগর, দক্ষিণ গ্রিস এবং রোমের কাছাকাছি অঞ্চল। বাংলাদেশ থেকে আসতে এমিরেটসের দুবাই ফ্লাইটে একবার মধ্যাহ্নভোজ দিয়েছিল। এবার পর্তুগাল ফ্লাইট মধ্যাহ্নভোজ সরবরাহ করলো। অভিন্ন যাত্রী হওয়ায় আমি এবারও পরখ করার জন্য মধ্যাহ্নভোজ গ্রহণ করলাম। লক্ষ্য করেছি আগের ফ্লাইটে ভারতীয় মাটন বিরিয়ানি পাওয়া গেছে। এবার পুরো ইউরোপীয় ডিস। এর মধ্যে ছিল সেদ্ধ মুরগির একটি টুকরো। আলু সেদ্ধ, কয়েকটি সেদ্ধ বিন, আখরোটসহ সালাদ, এক টুকরো রুটি, মেয়োনেস, চকলেট, বিয়ার ইত্যাদি। একসময় আমাদের বিমান ভূমধ্যসাগরের ওপর চলে এলো। দুই-তৃতীয়াংশ ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিতে ম্যাপ দেখালো আমাদের যাত্রা পথে এখন পর পর তিনটে শহর আছে—বার্সেলোনা, মাদ্রিদ এবং লিসবন।

আটটার কিছু পরে লিসবনে অবতরণ করার কথা। বাংলাদেশ হলে বলতাম রাত আটটা। বাংলাদেশের সাথে পাঁচ ঘণ্টা সময়ের হেরফের আছে পর্তুগালের। তাই বলা ভালো অপরাহ্ন আটটা। আটলান্টিক মহাসাগরের পাশে মোহনার নদী তাগো (ঞধমঁং) -এর তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো রঙিন ছবির মত শহর লিসবন। তাগো নদীকে অনেকে বলেন তেজো নদী। রৌদ্রকরোজ্জ্বল শহর বলে লিসবনের পরিচিতি আছে। খানিকবাদেই এর প্রমাণ পাওয়ার অপেক্ষা। বিমানের সাউন্ডবক্স চালু হলো। ক্যাপ্টেন জানালেন কিছুক্ষণ পরই আমরা লিসবনে অবতরণ করবো। স্থানীয় সময় তখন আটটা। নটায় সন্ধ্যা লাগে। তাই বলে গোধুলীলগ্ন নয়। বিকেলের ঝলমলে রোদ। বিমান নিচের দিকে নেমে আসছে। আটলান্টিক মহাসাগর দেখা যাচ্ছে। মোহনা থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রশস্ত তাগো নদী। দৃশ্যমান হচ্ছে পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ঘরবাড়ি। প্রায় সব বাড়ির গঠন যেন অভিন্ন। দোচালা চৌচালা লাল টালির ছাদ। রোদের আলোতে ঝলমল করছে। তাগো নদীতে ভাসছে ছোট বড় জাহাজ আর অনেক ত্রিকোণ পালতোলা নৌকা।

দীর্ঘ প্রায় বার ঘণ্টা বিমান যাত্রা শেষে আটটার কিছুটা পরে লিসবন বিমানবন্দরে অবতরণ করলো এমিরেটস এয়ারলাইন্সের বিমানটি। দুবাইতে এক ঘণ্টা যাত্রাবিরতি ছাড়া একটানা বিমান ভ্রমণ। তাই মাথাটা একটু ঝিম ঝিম করছিল। বাইরে তাকিয়ে বুঝলাম দিনের আলো ফুরোতে এখনো কিছুটা সময় বাকি।

লিসবন বিমানবন্দরে

কথাছিল বিমানবন্দরে আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে আসবেন এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মি. কার্লোস। অধ্যাপক কার্লোসের ছবি পাঠিয়ে

দুর্গনগরী এভোরায় জিরালদো স্কয়ার

দেয়া হয়েছিল। আমার ছবিও পেয়ে গেছেন তিনি। আশাকরি চেনাচেনিতে কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু বিমানবন্দরের নির্ধারিত লাউঞ্জে এসে অভ্যর্থনা জানানো মানুষের ভিড়ে কার্লোস চেহারার কাউকে পেলাম না। কিছুটা চিন্তিত হয়ে যখন দৃষ্টি ঘোরাচ্ছি তখন হঠাৎ সহাস্য মুখে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো বনি। অধ্যাপক কার্লোসের না আসতে পারার কারণটি ওর কাছ থেকে জানলাম। কার্লোসের স্ত্রী লিসবনের বিখ্যাত আলাকচিত্রী। তিনি দুর্ঘটনায় পায়ে আঘাত পেয়েছেন। তাই কার্লোসকে স্ত্রীর পাশে থাকতে হয়েছে। তাঁর অনুরোধেই বনিকে আসতে হয়েছে বিমানবন্দরে। ফলে এভোরা থেকে দেড় ঘণ্টা বাস জার্নি করে বনি বিকেলের মধ্যেই চলে এসেছে লিসবন।

লিসবনকে স্থানীয় মানুষ উচ্চারণ করে 'লিসবোয়া'। বিমানবন্দরে কিছুক্ষণ থাকতে গিয়ে বুঝলাম এখানকার অধিবাসীরা পর্তুগিজ ভাষা ছাড়া কথা বলে না। বিমানবন্দরে ইংরেজি নিয়ে কোনো সমস্যা না হলেও পরে দেখেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছাড়া রাস্তাঘাট, দোকানপাট সর্বত্র বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি বলে না, বোঝেও না। জনসংখ্যা ভীষণ কম। প্রায় চার হাজার কিলোমিটারের এই রাজধানী শহরের লোক সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লাখের মত।

লিসবনে নবোপলীয় যুগের মানব বসতির প্রমাণ পাওয়া গেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে মেগালিথিক সংস্কৃতির প্রত্নবস্তু। পরে কেল্টিক গোত্রের মানুষ খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বসবাস করেছে এখানে। এই ইন্দো-ইউরোপীয় কেল্টিকরাই পর্তুগালের আদি অধিবাসী।

পিউনিক যুদ্ধের পর অগাস্টাস সিজারের সময়ে রোমান আক্রমণকারীরা লিসবনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। ৪০৯ থেকে ৪২৯ খ্রিষ্টাব্দে রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে। এই আধিপত্য টিকে ছিল ৫৮৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। লিসবন ও এর আশেপাশে এখনো অনেক রোমান স্থাপত্য টিকে আছে। এরপর রোমান সভ্যতার পতনের যুগে জার্মানির উপজাতি ভিসিগথদের অধিকারে চলে আসে লিসবন। এই বর্বর আক্রমণকারীদের হাতে দেড়শতাধিক বছর অতিবাহিত করে লিসবন। এরপর মধ্যযুগে মুসলিম আক্রমণকারীরা লিসবনে অভিযান পরিচালনা করে। ৭১১ খ্রিষ্টাব্দে লিসবন মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। এ সময় এখানে অনেক মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মিত হয়। এখনো লিসবন ও এর চারপাশের শহরে মুসলিম স্থাপত্য এবং শিল্পকলার খোঁজ পাওয়া যায়।

আধুনিক লিসবনের যাত্রা শুরু হয় পনের থেকে সতের শতকে ভৌগোলিক আবিষ্কারের সময় থেকে। পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দ্য-গামার ভারত আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে যাত্রা শুরু হয়েছিল।

লিসবন থেকে এভোরা

বনির সাথে বিমানবন্দরের বাইরে এলাম। ততক্ষণে দিনের আলোর আর অবশিষ্ট নেই। সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হয়ে রাতের দিকে ছুটছে সময়। ঘড়িতে সাড়ে নটা বেজে গেছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেই ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে ট্যাক্সি পেয়ে গেলাম। বাসস্ট্যান্ড মূল শহরের একপ্রান্তে। এমনিতেই লোকসংখ্য কম। আরো সুনসান হয়ে গেছে। দিনের আলো অনেকক্ষণ থাকলেও ঘড়ির দশটা রাত দশটার মতই ওদের। কারণ ভোর ছটার মধ্যে দিনের আলো ফুটে যায়। একারণেই আমাদের হিসেবের সন্ধ্যায় অর্থাৎ পর্তুগালের রাত নটা দশটায় এখানকার মানুষ সাধারণত ডিনার সেরে ফেলে। এই বাস্তবতায় রাস্তায় লোক চলাচল কমে যেতে থাকে।

রাত সাড়ে নটার দিকে আমরা বাস টার্মিনালে এলাম। এখানেও যাত্রী প্রায় নেই বললেই চলে। এভোরাগামী বাস ছাড়বে রাত দশটায়। আমরা টিকিট কেটে অপেক্ষা করলাম। টার্মিনালে তিনটি বাস প্রস্তুত ছিল। এর কোনো একটা হয়তো এভোরা যাবে। পুরো ইউরোপেই বাসগুলো দেখার মত। ঝকঝকে তকতকে। একটি আচর পর্যন্ত নেই বাসের গায়ে।

এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণ পেয়ে একটি বাড়তি আনন্দ ছিল আমার। এভোরা সম্বন্ধে পুঁথিগত বিদ্যা আমাকে শহরটির ব্যাপারে বিশেষ কৌতূহলী করে তুলেছিল। এটি পর্তুগালের অন্যতম পর্যটন শহর। রাজধানী লিসবন থেকে এর দূরত্ব সড়ক পথে ১৪০ কিলোমিটার। নিয়ন্ত্রিত গতিতে বাস দেড় ঘণ্টায় পৌঁছে দেয়। সমুদ্র এবং নদী সান্নিধ্য থেকে অনেকটা দূরে এর অবস্থান। এভোরা স্থানীয় মানুষের উচ্চারণে 'ইভুরে'। খ্রিষ্টপূর্ব যুগ থেকেই কেল্টিকদের বসতি ছিল এখানে। কেল্টিকদের উচ্চারণে বলা হতো 'ইবুরা'। এভোরা এখন পর্তুগালের একটি জেলা শহর। প্রায় তেরশ কিলোমিটারের এই শহরটির লোকসংখ্যা সাড়ে ছাপ্পান্ন হাজারের মত। ৫৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট অগাস্টাস সিজারের সময় রোমানরা এভোরা দখল করে নেয়। চার শতকে বিশপ কুইন্টিয়ানাস-এর নিয়ন্ত্রণে চলে আসে শহরটি। বর্বর অভিযানের যুগে ভিসিগথদের হাতে এভোরা অধিকৃত হয়। তখন থেকে এভোরা পরিচিত হয় গির্জা নগরী হিসেবে। মুসলমান সেনাপতি তারিক বিন যায়িদ এভোরা দখল করে নেন ৭১২ খ্রিষ্টাব্দে। এসময় থেকে মুসলমানরা আরবি উচ্চারণে এভোরাকে বলতো 'ইয়াবুরাহ'। মুসলমানরা এখানে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ঘটায়। মসজিদ এবং দুর্গ নির্মাণ করে। ১১৬৫ খ্রিষ্টাব্দে এভোরা থেকে মুসলমানদের বিতাড়িত করেন জিরান্ড দ্য ফিয়ারলেস। পরের বছর অর্থাৎ ১১৬৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রথম আফনসো এখানকার শাসনভার গ্রহণ করেন।

রাত পৌনে দশটায় আমাদের নির্দিষ্ট বাসটি টার্মিনালে এসে দাঁড়ালো। বনিকে নিয়ে জানালার পাশে বসলাম। কাটায় কাটায় দশটায় বাস ছেড়ে দিল। বাসের দুই-তৃতীয়াংশ আসনই ফাঁকা। পথে আরো দু-তিনটে স্টপেজ আছে ওখান থেকে কিছু যাত্রী উঠতে পারে। টার্মিনাল পার হতেই বুঝতে পারলাম শহর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে বাস। এমনিতেই পথেঘাটে লোকজন তেমন নেই এখন আরো সুনসান হয়ে গেল। দুপাশেই আলো আঁধারিতে মাঝে মাঝে অনুচ্চ পাহাড় চোখে পড়লো। আমাদের ডান পাশে সম্ভবত দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হবে পাহাড়ের ধাপে ধাপে এবং পাদদেশে ঘরবাড়ি চোখে পড়ছে। বাঁ দিকটা বিরান। গাছপালা ঝোপঝাড়। বোঝা যাচ্ছিল ডান পাশে পাহাড়ের বিপরীত দিক দিয়ে তাগো নদী বয়ে যাচ্ছে। পরে আমরা নদীর একটি ধারার ওপর দিয়ে ব্রিজ পার হয়েছি। বনি জানালো কিছু পরেই ডান পাশে বাড়িঘর ছাপিয়ে পাহাড়ের চূড়ায় মধ্যযুগের একটি দুর্গ দেখতে পাবেন। ওর কথা শেষ না হতেই দৃষ্টি সীমায় দুর্গ ধরা দিল। নিঝুম নিরালায় অনেকটা জায়গাজুড়ে দুর্গটি দাঁড়িয়ে আছে। কয়েকটি বাতি জ্বলছে তাই দুর্গের অবয়ব বোঝা যাচ্ছিল। বইপত্রে অনেক দেখা মধ্যযুগের দুর্গ দেয়ালের বৈশিষ্ট্য এখানেও স্পষ্ট।

এই দুর্গটির কথা আগে পড়েছি। পর্তুগালের ইতিহাসের সাথে দুর্গটির ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। মুসলিম বিজেতাদের গড়া এই দুর্গটির স্থানীয় নাম 'ক্যাসেলো দ্য সাও জর্জ'। প্রত্নতাত্ত্বিক খনন থেকে জানা যায় প্রাচীনকালেও এখানে একটি দুর্গ ছিল। এটি নির্মিত হয়েছিল খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন খ্রিষ্টপূর্ব ছয় শতকেও এখানে একটি দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। লিসবনে রোমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ৪৮ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এই দুর্গ পুনর্নির্মিত হয়। পরে মুসলিম অধিকারের পর নতুনভাবে গড়ে তালা হয় এই দুর্গটি। যা এখন দৃশ্যমান।

এই পাহাড়ে এবং দুর্গ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে খ্রিষ্টপূর্ব যুগে কেল্টিক উপজাতিগোষ্ঠী বসবাস করতো। এরপর এখানে আসে ফিনিশীয়, গ্রিক এবং কার্থেজবাসী। এই ধারাবাহিকতায় এরপর এখানে একে একে বসতি গড়ে রোমান, ভিসিগথ এবং সবশেষে মুসলমানরা। মুসলমানদের হাতে এই দুর্গটি নতুন রূপ পায় ১০ শতকে।

নীরব রাতে এভোরায়

রাত সাড়ে এগারোটায় এভোরা টার্মিনালে আমাদের বাস ভিড়লো। মনে হলো পুরো শহরটি ঘুমিয়ে আছে। টার্মিনালেও খুব একটা মানুষের সাড়া নেই। একটি মাত্র ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ড্রাইভিং সিটে বসে আছেন একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। চেহারা ও আকৃতিতে পর্তুগিজ বলেই মনে হলো। বনি পর্তুগিজ ভাষায় কথা বলে নিল। আমার ট্রলিব্যাগটা পেছনের বনেটের ভেতরে রাখলাম। রাস্তায় কাকপক্ষীটিও নেই। শহরের এদিকটিতে তেমন উঁচু কোনো ইমারত চোখে পড়লো না। দোকানপাট, অফিসপাড়া, বাড়িঘর যা দেখতে পেলাম তা চারতলার বেশি নয়। কিন্তু পুরো শহরটি যেন সাজানো গুছানো। বৈদ্যুতিক বাতিতে যতদূর দেখা যাচ্ছিল সব ঝক ঝকে তক তকে। দেয়ালে রং চটে যাওয়া কোনো ঘরবাড়ি চোখে পড়লো না। প্রশস্ত রাস্তা। সকল ধরনের দালান কোঠার সামনেই চওড়া লন। ঢাকা শহরের ঘিঞ্জিদশার ছবিটি একবার কল্পনা করলাম।

বনি জানালো এখানে শহরের দুটো অংশ আছে। একটি রোমান ও মুসলিম আধিপত্যের যুগে গড়া দুর্গ ঘেরা নগরী আর দুর্গের বাইরে আধুনিক নগরী। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে দুর্গনগরীর ভেতরে 'এভোরা ইন' নামের হোটেলে। দুর্গনগরীর ভেতরেই বেশিরভাগ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। যেমন—এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়, জাদুঘর, প্রচীন বিখ্যাত

জুরিবোর্ড

চার্চ, রোমান মন্দির, রোমান ফোরাম, কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বাণিজ্যবিতান, পার্ক ইত্যাদি। বনিরা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে থাকে। হোস্টেলটি দুর্গ নগরীর বাইরে। এক সময় দুর্গ দেয়াল চোখে পড়লো। স্পষ্ট হলো মধ্যযুগের দুর্গ দেয়ালের আদল। দুর্গ তোরণের ভেতর দিয়ে ঢুকে গেল ট্যাক্সি। এবার রাস্তার রূপ পাল্টে গেল। ভেতরের রাস্তা তেমন প্রশস্ত নয়। পিচঢালা মসৃণও নয়। সব পাথরের নানা টুকরো বসানো যেন। আসলে প্রাচীন রোমানদের রাস্তার আদল অবিকল ধরে রেখেছে আধুনি এভোরা। যেন দুর্গের ভেতরে ঢুকলে ইতিহাসে ফিরে যাওয়া যায়। মনে মনে ঠিক করলাম কাল দিনের আলোতে সব পরখ করতে হবে।

আমরা এসে থামলাম চারদিকে সাজানো পুরনো স্থাপত্যশৈলীর অনেকগুলো ইমারতের মাঝখানে প্রশস্ত উন্মুক্ত একটি স্কয়ারের সামনে। দুর্গ শহরের এটাই প্রাণকেন্দ্র। এর নাম জিরালদো স্কয়ার। এখানে কোনো ইমারতই চারতলার বেশি নয়। স্কয়ারের দুদিক দিয়ে ঘোরানো রাস্তা। ডান-বামে, সামনে-পেছনে বেরিয়ে যাওয়ার অনেকগুলো রাস্তা রয়েছে। উত্তর দিকে পূর্ব-পশ্চিমে যে টানা ইমারত রয়েছে এরই মাঝামাঝি 'এভোরা ইন' দেখতে পেলাম।

হোটেল এভোরা ইন

ইউরোপের হোটেলগুলোর আদল বাংলাদেশের মত নয়। বড় কোনো সাইনবোর্ড নেই। 'হোটেল বয়' ধরনের ধারণাই নেই এখানে। একজন ম্যানেজার আর দু-একজন সহকারী মিলেই একটি হোটেল পরিচালিত হয়। তাই রিসিপশনে লোকজনের ছড়াছড়ি চোখে পড়বে না। বড় বড় হোটেলের ক্ষেত্রে হয়তো ভিন্নরূপ রয়েছে। তবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে দেখেছি এভোরা ইনের মতো ৪-৫টি বা ১০-১২টি কক্ষ নিয়ে গেস্ট হাউসের মত হোটেল। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রিত থাকায় বাড়তি সাহায্যকারীর প্রয়োজনও পড়ে না।

আমরা দেখলাম সারি সারি দোকানপাটের মাঝখানে তিন-সাড়ে তিন ফুটের একটি কাচের দরোজা। এর মাঝামাঝি এক চিলতে জায়গায় লোগোসহ লেখা আছে এভোরা ইন। আমাদের দেশের হোটেলগুলোর মত এখানে কোনো দ্বাররক্ষী নেই। ভেতরটা অন্ধকার। যেন সবকিছু ঘুমিয়ে আছে। দরোজার একপাশে একটি মেশিন সাঁটা। তাতে ১, ২, ৩ এরকম লেখা কয়েকটি বুতাম। আছে একটি স্পিকার। বনি কলিং বেলের মত একটি বুতাম চাপলো। কিছুক্ষণের মধ্যে স্পিকারের পাশে ছোট্ট সাউন্ড বক্সে একটি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এলো। ইংরেজি এবং পর্তুগিজ মিশিয়ে কথা বলছিলেন। বনি আমার আগমনের কথা জানালেন। তিনি একটি কোড নম্বর বললেন। সেই মত কয়েকটি বুতাম চাপতেই দরোজা খুলে গেলো।

অন্ধকার ঘরে ঢুকেই টের পেলাম বাঁ পাশে উপরে ওঠার সিঁড়ি। অনুমান করে সিঁড়িতে পা রাখতেই উপর থেকে যেন সুইচ টেপার শব্দ পেলাম। আলোকিত হয়ে গেল সিঁড়ি। কিন্তু কোনো মানুষের দেখা নেই। দোতলার সিঁড়িটি যথারীতি অন্ধকার। সেখানে পা দিতেই আবার সুইচ টেপার শব্দ। আলোকিত হয়ে গেল দোতলার সিঁড়ি। আর একই সাথে নিচের সিঁড়ির বাতি বন্ধ হয়ে অন্ধকার হয়ে গেল। যেন কোনো অদৃশ্য কেউ টর্চ জ্বালিয়ে পথ দেখাচ্ছে। তৃতীয় তলায় উঠতেই একই কাণ্ড। নিচের সিঁড়িগুলো অন্ধকার হয়ে গেছে। মনে মনে ভাবলাম এই হোটেলের ম্যানেজার বোধহয় খুব হিসেবি। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে ব্যস্ত। কিন্তু যিনি সুইচ জ্বালাচ্ছেন আর নিভাচ্ছেন তার দেখা মিলছে না। পরে বুঝলাম পুরোটাই স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থাপনা। তৃতীয় তলায় এসে আমরা সহাস্য বদনে দাঁড়ানো এক মাঝ বয়সী পর্তুগিজ ভদ্রলোককে পেলাম। তিনিই এভোরা ইনের অন্যতম ম্যানেজার। আমার জন্য বরাদ্দ ঘরটি খুলে দিলেন। ভেতরের বাতি জ্বালাতে সব ঝলমল করে উঠলো।

হোটেল থেকে হোস্টেল

এভোরা ইনে এটি ছোটখাটো একটি ঘর। নিপাট গোছানো। একদিকে একটি বড় আয়না আর টেবিল। ছোট্ট সোফা ও একটি কুশন চেয়ার। খাটের শেষ দিকের দেয়ালজুড়ে ম্যাডোনার ছবি। এক কোণে টেলিভিশন। আর দরজার পাশে কাপড় ও জুতো রাখার আলমিরা। আমার বেশি পছন্দ হলো বাথরুমটি। বাথটাব থেকে শুরু করে সকল আধুনিক ব্যবস্থা রয়েছে।

এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়

২৭ এপ্রিল দিনটা একটু অন্যরকম আমাদের জন্য। আমাদের বলতে আমার আর সাজিদ বিন দোজা বনির কথা বলছি। এদিন বনির পিএইচডি'র জুরি বোর্ড বসবে দুপুরের পর। একাডেমিক প্রশ্নের মুখোমুখি হবে বনি। ওর ডিগ্রি হওয়া না হওয়ার নিষ্পত্তি আজকেই হবে। জুরি বোর্ডের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ও। আমার জন্য একটি ভিন্ন

অনুভূতিও কাজ করছে। এই ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের অনেক খ্যাতিমান দার্শনিক-পণ্ডিত গড়ে তুলেছে। অনেক প্রখ্যাত অধ্যাপক এখানে অধ্যাপনা করেছেন। তেমন একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অন্য রকম হবে।

পর্তুগালের দ্বিতীয় প্রাচীন এই এভোরা বিশ্ববিদ্যালয়। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে এর যাত্রা ১৫৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। কার্ডিনাল হেনরিখ এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। দাপ্তরিক ভাষায় পর্তুগিজরা এই বিশপকে বলে থাকে কার্ডিনাল ইনফান্টো ডম হেনরিখ। এযুগে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। তাই পোপের অনুমোদনের প্রয়োজন হতো। এ বছরই পোপ চতুর্থ পল প্রতিষ্ঠানটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেন। এটি ছিল ক্যাথলিক খ্রিষ্টান বিশ্ববিদ্যালয়। জন্মের পর একটানা চলে বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৭৭৯ খ্রিষ্টাব্দে বন্ধ হয়ে যায়। ২০০ বছর পর ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হয়। এ পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট অব এভোরা'। পর্তুগিজ ভাষায় 'ইনস্টিটিউটো ইউনিভার্সিটারিও দ্য ইভুরা'। এসময় থেকে এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করে সে দেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শুনেছি সেই ষোল শতক-পর্বের ইমারত কাঠামো সংরক্ষিত আছে এবং সেখানে এখনো ক্লাস নেয়া হয়। আমি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের ছাত্র। তাই ঐতিহাসিক একটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর প্রত্নস্থাপনা দেখার সুযোগ আজ হবে এই বিষয়টি আমাকে খুব রোমাঞ্চিত করছে। আমি গোসল সেরে প্রস্তুতি নিয়ে নিলাম। রীতি অনুযায়ী জুরি বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে থিসিস মূল্যায়নের লিখিত রিপোর্ট পড়তে হবে। পরে শুরু হবে প্রশ্নোত্তর পর্ব। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাস তিনেক আগেই থিসিসের সফট কপি পাঠিয়েছিল। ফলে মূল্যায়ন প্রতিবেদন তৈরি করে নিয়ে এসেছিলাম। এগুলো সব ব্যাগে গুছিয়ে নিলাম। বনি বলেছিল এ বেলা ওদের গবেষণা সেন্টারে নিয়ে যাবে। সেখানে ওর সুপারভাইজারের (এখানে বলে ওরিয়েটাডোর) সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। এ বেলাটা উনি আমাকে সঙ্গ দেবেন এবং লাঞ্চ করাবেন।

রিসার্স সেন্টারে

বনিদের রিসার্স সেন্টার এভোরা ক্যাথেড্রাল লাগোয়া। দোতলা পুরনো বাড়ি। আগেই জেনেছি দুর্গনগরীর প্রাচীন ধারাটিকে বজায় রেখেই সংরক্ষণ করা হয়েছে। সেন্ট্রাল স্কয়ারের অংশেই এই সেন্টার। উত্তর দিকে প্রায় ৫০০ মিটার এগিয়ে গেলেই রোমান মন্দির পাওয়া যাবে। আর এই মন্দিরের কিছুটা পশ্চিমে দোতলা টানা দালান। একই ধরনের ইমারত রয়েছে এর পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণে টানা। এটি আদি রোমান ফোরাম। রোম আধিপত্যের যুগে এখানে রোমান অভিজাতদের বসতি ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হতো। এভোরাতে দেখলাম প্রত্নস্থাপনা সংরক্ষণের ভিন্ন রীতি আছে। ইমারতগুলোকে শুধু দর্শনীয় বস্তু করে রাখেনি। পুরনো বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন ফোরামের ইমারতে এখন পরিচালিত হচ্ছে ইস্কুল ও প্রশাসনিক দপ্তর।

বনিদের রিসার্স সেন্টার দেয়াল ঘেরা একটি আলাদা বাড়ির মত। গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকলে একটি খোলা চত্বর পাওয়া যাবে। উঠোনের মাঝখানে একটি বড় গাছ। বৃত্তাকারে কংক্রিট দিয়ে বাঁধানো। এখানে বসে আড্ডা দেয়া যায়। মনে হয় না গবেষকদের তেমন ফুরসুত থাকে। রিসার্স সেন্টারটির নিচতলার বেশিরভাগ ঘরে দাপ্তরিক কাজ হয়। প্রফেসরদের বসার চেম্বারও আছে। আর আছে সেমিনার হল। বনি একটি দপ্তরে নিয়ে গেল। একজন মাঝ বয়সি পর্তুগিজ মহিলার চেম্বার। সম্ভবত আজকে জুরির ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে আছেন। আমি লক্ষ্য করলাম বনির সাথে সকলের খুব ভালো ভাব রয়েছে। বেশ বোঝা গেল ওকে সবাই পছন্দ করে। আজকের জুরি নিয়ে কথা হলো। সবাই শুভেচ্ছা জানালো বনিকে। দোতলায় রয়েছে গবেষকদের নির্দিষ্ট কর্নার। বনি পাশাপাশি একজন চিত্র শিল্পীও। ওর ডেস্কের পাশের দেয়ালে নানা ধরনের স্কেচ টানানো আছে। এর বেশিরভাগ এভোরা ও লিসবনের দর্শনীয় স্থানের স্কেচ। জানলাম মে মাসের ১ তারিখ থেকে লিসবন জাদুঘরে বনির আঁকা স্কেচ ও পেইন্টিংয়ের একক প্রদর্শনী হবে। সেসব ছবিরও কয়েকটি রোল করে রাখা আছে।

এখানে পরিচিত হলাম এক নেপালি কন্যার সাথে। নাম মোনালিসা। বনির একই সুপারভাইজারের অধীনে পিএইডি গবেষণা করছে। হাসি খুশি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। ভালো ইংরেজি বলে। ও ওর দেশের কথা, এখানকার গবেষণার কথা—এসব জানালো।

মিসেস গ্যাব্রিলার সঙ্গে

বনি নিচের ক্যান্টিন থেকে কয়েক কাপ কফি নিয়ে এলো। ছোট্ট কাপে কালো র কফি। তেঁতো ও আমার কাছে কিছুটা বিস্বাদও বটে। তবে পান করার পর চনমনে হয় শরীর।

ফিলিপ বারাতা

বনি জানালো কিছুক্ষণের মধ্যে প্রফেসর চলে আসবেন। আমরা সেমিনার লাইব্রেরিতে বসবো। প্রফেসর ফিলিপ থেমুডো বারাতা ইতিহাসের একজন প্রবীণ অধ্যাপক। একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতিমান। পর্তুগালের অধিবাসী তিনি।

আমরা সেমিনার লাইব্রেরিতে এলাম। শুধু গবেষকদের জন্য নির্ধারিত বলে খুব বড়সর লাইব্রেরি নয়। কয়েকটা র‍্যাকে থরে থরে বই সাজানো রয়েছে। একটি লম্বা টেবিলের দুপাশে কয়েকটি চেয়ার পাতা। অল্প কিছুক্ষণ পরে প্রফেসর বারাতা এসে পৌঁছলেন। একজন সুদর্শন প্রৌঢ় ভদ্রলোক। আমরা করমর্দন করে পরস্পর পরিচিত হলাম। আমার কুশল জানতে চাইলেন। তিনি যে খুব সজ্জন মানুষ প্রথম আলাপেই বোঝা গেল। একাডেমিক নানা বিষয়ে দীর্ঘ গল্প হলো। বুঝলাম তিনি গল্প করতে বেশ পছন্দ করেন। বনির কাজেরও খুব প্রশংসা করলেন তিনি। এর মধ্যে মোনালিসা এলো। যদিও আমাদের পরিচয় পর্ব আগেই হয়ে গিয়েছিল তবু অধ্যাপক তাঁর ছাত্রীকে কীভাবে পরিচয় করান তা দেখার আগ্রহে আমি কৌতূহল নিয়ে তাকালাম। বুঝলাম বনি মোনালিসার প্রফেসর ফিলিপ বারাতার স্নেহের আশ্রয়েই আছে। অধ্যাপক বিশেষভাবে আগ্রহী বাংলাদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের ইতিহাস জানতে। বিশেষ করে পর্তুগিজ বসতি ও বাণিজ্য কেন্দ্র নিয়ে কতটুকু গবেষণা হয়েছে তা জানতে

চাচ্ছিলেন। বোঝা গেল প্রফেসর বারাতা আমার গবেষণা অঞ্চল সম্পর্কে আগে থেকে কিছুটা খোঁজ রেখেছেন। সম্ভবত আমার সিভিটি ভালো করে পড়েছেন তিনি। তাঁর ইচ্ছে ভবিষ্যতে আমি যাতে বাংলাদেশে পর্তুগিজ চ্যাপ্টার নিয়ে কাজ করি। প্রফেসর ফিলিপ বারাতা তাঁর গবেষণা কর্ম নিয়ে বিস্তারিত ধারণা দিলেন। তাঁর একটি স্বপ্নের কথা বললেন। ভবিষ্যতে তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলাদেশ স্টাডি সেন্টার' খুলতে চান। বললেন তা সম্ভব হলে দুই দেশের মধ্যে একটি গবেষণার ক্ষেত্র তৈরি হবে। বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের গবেষণা কাজে পর্তুগালে আসার সুযোগ হবে। এ ব্যাপারে আমার সহযোগিতাও চাইলেন তিনি।

আমার বক্তৃতার বিষয়টি নিয়ে প্রফেসর বারাতা সাথে কথা বলেন। এভোরাতে আমার আতিথেয়তার মেয়াদ ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত। যেহেতু আমি নিজ ব্যবস্থাপনায় আরো কটা দিন থাকবো তাই সেমিনারের দিন ঠিক করা হলো ২৯ এপ্রিল অপরাহ্নে। আমার ডিজিটাল সুবিধা কি কি লাগবে সব জেনে নিলেন। বারাতা আমাকে উপহার দিলেন বেশ কয়েকটি মূল্যবান বই।

জুরি আসরের অভিজ্ঞতা

সাত সদস্যের জুরি বোর্ড। সভাপতিত্ব করবেন প্রফেসর ফাতিমা নানস। বাকি সকলেই পুরুষ। একজন বনির সুপারভাইজার ফিলিপ বারাতা, আমি ছাড়া বাকি চার সদস্য পর্তুগালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। প্রাচীন ক্যাথলিক রীতিতে পুরো আয়োজনটি সম্পন্ন করা হয়েছে। এর দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে। নিচতলার একটি বিশেষ কক্ষে জুরি বসবে। আগে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো দোতলায় একটি কক্ষে। সেখানে বিশেষ ধরনের গাউন রাখা আছে। জুড়ি বোর্ডের প্রত্যেক সদস্যকে এই গাউন পরতে হবে। এখানে প্রশাসনিক কর্মকর্তা মিসেস গ্যাব্রিলা উপস্থিত ছিলেন। পর্তুগালে আসার সূত্রে তাঁর সাথে অনেকবার চিঠি চালাচালি হয়েছে। দেখা হলো অধ্যাপক কার্লোসের সাথে। লিসবন বিমানবন্দরে আমাকে আনার জন্য যাঁর যাওয়ার কথা ছিল। পরিচিত হলাম ফাতিমা নানসের সাথে। তাঁর সাথে পর্তুগাল আসার আগে নিমন্ত্রণের সূত্রে বেশ কয়েকবার ই-মেইলে যোগাযোগ হয়েছিল। অসাধারণ আকর্ষণীয় চরিত্র এই অধ্যাপিকার। ভীষণ স্মার্ট। ইংরেজি বলার ধরনটি অনুকরণযোগ্য। অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ কাছের করে নিলেন। জুরি বোর্ডের অন্য সদস্য প্রফেসরদের সাথেও পরিচিত হলাম। এবার গাউন পরার পালা। আমাকে সহায়তা করলেন মিসেস গ্যাব্রিলা ও কার্লোস।

রীতি অনুযায়ী ধীর পদক্ষেপে সারিবদ্ধ হয়ে ফাতিমা নানসের নেতৃত্বে আমাদের জুরির কক্ষে যেতে হবে। পরিবেশটি হবে খুব ভাবগাম্ভীর্যময়। আমাদের ছোট্ট মিছিল সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতেই দেখা গেল করিডোরের দুপাশে ছাত্রছাত্রীরা অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথা অনুযায়ী আমাদের সম্মান দেখিয়ে সকলের মাথা অবনত। আমরা প্রাচীন রোমের অভিজাতদের মত যেন এগুতে লাগলাম।

জুরি বোর্ডের নির্ধারিত কক্ষটি খুব দূরে নয়। আমাদের মিছিল ধীর পায়ে ভেতরে প্রবেশ করলো। এটি সেই প্রাচীন কালের ইমারত। কক্ষের পুরো ব্যবস্থাপনাটিও আদি কালের। কক্ষে ঢুকতেই দুপাশে অভ্যাগতদের জন্য বেঞ্চ পাতা। হয়তো সাকুল্যে ৩০-৩৫ জন বসতে পারবে। শেষ দেয়ালের সাথে উঁচু বেদি। স্থায়ী মঞ্চও বলা যেতে পারে। পুরোটা পাথরে বাঁধানো। প্রস্তজুড়ে টানা মঞ্চ। দুপাশ থেকে দুটো বাহু বেরিয়ে মঞ্চটাকে কিছুটা 'ইউ প্যাটার্ন' করেছে।

মঞ্চের ওপর টানা টেবিল পাতা। পেছনে দেয়াল ঘেঁষে সাতটি চেয়ার। মাঝখানে রাখা সভাপতির চেয়ারটি অপেক্ষাকৃত উঁচু। জুরি বোর্ডের একমাত্র বিদেশি সদস্য হিসেবে ফাতিমা নানস আমাকে বিশেষ সম্মান দেখালেন। আমার জন্য তাঁর বাঁ পাশের চেয়ারটি সংরক্ষিত ছিল। আমরা সকলে আসন গ্রহণ করলাম। আমরা বসার পর আমন্ত্রিত শিক্ষক ও ছাত্ররা পাতা বেঞ্চে আসন গ্রহণ করলেন।

জুরি বোর্ডের কার্যক্রম

দুদিকের বাহু ৫-৭ ফুট প্রলম্বিত। আমাদের বাঁ পাশের বাহুর শেষ প্রান্তে মঞ্চের দিকে মুখ করে বসেছেন একজন ভদ্রমহিলা। তিনি এ আয়োজনের সচিব। তাঁর সামনে পাতা টেবিলে একটি কম্পিউটার ও প্রিন্টার রয়েছে। আর ডান পাশের বাহুতে চেয়ার পেতে বসেছে গবেষক সাজিদ বিন দোজা বনি। অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি সে। সামনে একটি মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর। ফাতিমা নানস নিচু স্বরে আমার সাথে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিলেন। বললেন এ ধরনের জুরিতে নানা বিতর্ক তৈরি হতে পারে। এখানে তেমন হলে আপনার সিদ্ধান্তকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দেবো।

ছবি-৫

সভাপতি জুরি শুরু করলেন। প্রথমেই সামনে উপবিষ্ট অভ্যাগতদের সাথে জুরি বোর্ডের সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। বনির গবেষণা সম্পর্কে সামান্য আলোকপাত করলেন। প্রফেসর বারাতাও কিছুটা আলোকপাত করলেন। আমরা আমাদের লিখিত মূল্যায়ন পড়ে শোনালাম। বনিকে তার বক্তব্য উপস্থাপন করতে বলা হলো। ওর গবেষণার বিষয় ছিল বাংলা বদ্বীপ অঞ্চলের দুর্গ সুরক্ষিত মহাস্থানগড় এবং প্রচীন নগর হিসেবে এখানে মানব বসতির ধারা প্রসঙ্গ। বনি চমৎকারভাবে ওর গবেষণার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করলো। এবার সভাপতির অনুমতি নিয়ে বনি ওর তৈরি মহাস্থানগড়ের মানব বসতির ওপর একটি এনিমেশন চিত্র উস্থাপন করে। এই এনিমেশনে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের মহাস্থানগড়। এপর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পালা। বনি সকলের প্রশ্নেরই পাণ্ডিত্যপূর্ণ জবাব দিচ্ছিল। পর্তুগালের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক একটি উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি পাল্টা প্রশ্ন করতে থাকলেন। আমার কাছে মনে হলে অধ্যাপক বিষয়টি ঠিক হয়তো বুঝতে পারেননি। সভাপতির অনুমতি নিয়ে আমি বিষয়টি ব্যাখ্যা করে যুক্তি দিয়ে বোঝালাম যা বনির বক্তব্যকেই সমর্থন করে। এভাবে ছোট্ট বিতর্কটির অবসান ঘটলো। সকলেই ঐকমত্যের মাধ্যমেই বনিকে পিএইচডি ডিগ্রি দেয়ার পক্ষে মতামত দিলেন।

ওদের একটি পেশাদারিত্ব আমার দৃষ্টি কাড়লো। চূড়ান্ত রিপোর্টের বক্তব্য বিষয় ফাতিমা নানস বলে যাচ্ছিলেন আর সচিব ম্যাডাম সাথে সাথে কম্পোজ করে প্রিন্ট বের করে দিলেন। সভাপতি ছোটখাটো সংশোধন করে আমাকে দেখতে দিলেন। আমি চোখ বুলিয়ে মাথা নেড়ে এই রিপোর্টটি যথার্থ হয়েছে বলে সম্মতি জানালাম। ফাতিমা নানস জুরি বোর্ডের সকল সদস্যকে পড়ে শোনালেন। কারো কোনো আপত্তি ছিল না। সচিব সংশোধন করে চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রিন্ট করলেন। আমরা সকলে স্বাক্ষর করলাম। বনি সকলের অভিনন্দনে আপ্লুত হলো। ওর মুখে তখন উদ্ভাসিত হাসি।

এখানে পরিচিত হলাম এক নেপালি কন্যার সাথে। নাম মোনালিসা। বনির একই সুপারভাইজারের অধীনে পিএইচডি গবেষণা করছে। হাসি খুশি মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। ভালো ইংরেজি বলে। ও ওর দেশের কথা, এখানকার গবেষণার কথা—এসব জানালো। বনি নিচের ক্যান্টিন থেকে কয়েক কাপ কফি নিয়ে এলো। ছোট্ট কাপে কালো র কফি। তেঁতো ও আমার কাছে কিছুটা বিস্বাদও বটে। তবে পান করার পর চনমনে হয় শরীর